ব ন্দি নী

বন্দিনী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

ডা. সাবরিনা হুসেন মিষ্টি

শব্দশৈলী

উৎসর্গ

নানিকে আমি বুবলী ডাকি। আমার বুবলী আমাকে গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াতেন। দেশ-বিদেশের রূপকথা শোনানোর পাশাপাশি যখন গল্পের মজুতে টান পড়ত, তখন বানিয়ে বানিয়ে শোনাতেন। যখন আরেকটু বড় হলাম, তখন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বনফুলের গল্প পড়ে শোনাতেন। সাহিত্য অনুরাগ তৈরি করেন আমার বুবলী। এ বই আমার বুবলী রওশন আরা খানকে উৎসর্গ করলাম। কঠিন স্বভাবের ছোটখাটো এই নারী আমার জীবনে বিশাল এক স্থান অধিকার করে আছেন।

মুখবন্ধ

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সব মানুষই লেখে। হরেক রকম না-বলা কথা সে মনের পাতায় লিখে রাখে। সেই লেখা চলে আজীবন। এই মনের পাতায় লেখার সে নিজেই একমাত্র পাঠক। মাঝে মাঝেই অবসর পেলে সে মনের খাতার পাতাগুলো ওল্টায়। কারও কারও ক্ষেত্রে সেই লেখা কাগজ-কলমে উঠে আসে। তখন তার সাথে পাঠকও সেই লেখা পড়ে।

আমি মনে মনে সবচেয়ে বেশি লিখেছি কারাগারে বসে। সেখানে কাগজ-কলম ব্যবহারের অনুমতি নেই। শুধু দুসপ্তাহ অন্তর অন্তর নিজ পরিবারের কাছে চিঠি লেখার অনুমতি আছে। সেটাও কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ নজরদারিতে। কাজেই মনের লেখা স্তূপীকৃত হয়েছে। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কাগজ-কলমে লিখব। আজ না হয় কাল, কাল নয়তো কোনো এক দিন। অজানা অচেনা এ জগতের কথাগুলো শব্দ আর বাক্যে গাঁথার প্রবল তাগিদ অনুভব করেছি।

যে মা তাঁর সন্তানের ওপর হওয়া নির্মম অত্যাচার দেখে স্থির থাকতে না পেরে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন, তাঁর কথা কেউ জানবে না, এটা কি হয়? কোন হতাশায় ধনীর দুলারিরা সবকিছু পাওয়ার পরও হতাশা থেকে মুক্তি পেতে মাদকের আশ্রয় নেন? রাজপথের প্রতিবাদী এক নারী কেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে অবরুদ্ধ জীবন কাটান? কেন একজন অতি সাধারণ নিরীহ স্ত্রী দিনের পর দিন স্বামীর অবহেলা আর অনাচার সহ্য করতে করতে একসময় অতিষ্ঠ আর হিংস্র হয়ে ওঠেন? মানুষকে জানতে হবে, কীভাবে একজন প্রতারক নারী সমাজকে অবক্ষয়ের পথে নিয়ে যান।

কারাগারে টিনের একটি থালায় ঝরে পড়া চোখের পানিতে লেখা আছে কত শত গল্প! মূল ভবনের পেছনের নির্জন ধোপাচালিতে ভরদুপুরে কার জানি ফিসফিসানি শোনা যায়! যাঁরা কারাগারেই বন্দী থাকা অবস্থায় মরে গেছেন, তাঁদের আত্মা নাকি এখানে ঘোরাফেরা করে। ভয়াল চৌদ্দ শিকের দরজা-জানালাগুলো কত কাহিনির সাক্ষী!

কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের আনাচকানাচে কত যন্ত্রণা, কষ্ট, নৃশংসতা আর অস্থিরতার কাহিনি! এখানকার বাতাসে কত দীর্ঘশ্বাস আর অনুশোচনার হাপিত্যেশ!

কেউ লেখেননি বিউটি, রুমা, রহিমা, মুনিরা, রূপা ও জমিলাদের কথা। কেমন ছিলেন তাঁরা, কেমন আছেন এখন? আমাকে লিখতে হবে, আপনাদেরও পড়তে হবে। কেননা তাঁরা অন্য গ্রহের প্রাণী নন, এ সমাজই তাঁদের জন্ম দিয়েছে।

মৃত্যুর পর পাপকাজের শাস্তি হিসেবে দোজখে বাস করতে হয়, কিন্তু ইহজনমে শাস্তি দেয়ার জায়গা হলো কারাগার। জেলখানা তাই নরকেরই ক্ষুদ্র একটি অংশ। তবে পার্থক্য একটাই, সৃষ্টিকর্তা কাউকে বিনা অপরাধে দোজখবাস করান না, কিন্তু কারাগারে অনেকে বিনা অপরাধে সাজা ভোগ করেন। তাঁদের কথা তুলে আনাও আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

রিপুর দহনে কাম, ক্রোধ, মোহ ও লোভের অতিশয্যে মানুষ যেমন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, তেমনি আবার তীব্র ভালোবাসা আর প্রবল অভিমানেও কিন্তু অপরাধ করে বসে। মানুষ কখনো কখনো মিথ্যা অপবাদেও বহন করে অপরাধী তকমা।

কারাগারের সেই সব নারী বন্দীদের অব্যক্ত সত্যকথন নিয়েই আমার *বন্দিনী* দ্বিতীয় খণ্ড।

ড. সাবরিনা হুসেন মিষ্টি
ঢাকা

পাগলি

চৈত্র মাসের ভরদুপুরে গা চিড়বিড়ে রোদ। গরমে ধুঁকছে কাশিমপুর কারাগার। এর মধ্যে হাজতিরা পারতপক্ষে নিজ নিজ রুম থেকে সহজে বের হতে চান না। কয়েদিদের তো কাজ করতেই হবে, তাঁরা বাধ্য। আমি তখন কয়েদি হিসেবে ফুলবাগানের মালির দায়িত্বে।

আমাকে জেলার আপা ডেকে পাঠিয়েছেন ভ্যানগাড়ি থেকে ফুলের টব নামানোর জন্য। কারাফটকের দুই পাশে সাজানোর জন্য ফুলের বিশটা টব আনা হয়েছে। আমি কোনোমতে একজন হাজতিকে রাজি করালাম টব নামানোর কাজে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য। বিনিময়ে তাঁকে দু-একটা ললি আইসক্রিম খাওয়াতে হবে।

টবগুলো নামিয়ে সাজাচ্ছি, এমন সময় শুনি অদূরেই মাঠের একটা জটলা থেকে উচ্চৈঃস্বরে হাসাহাসির শব্দ ভেসে আসছে। এই গনগনে আগুনঢালা দুপুরে ঘরে না থেকে হাজতিরা মাঠে জটলা পাকাচ্ছেন, কাহিনি কী? মানুষ যখন নিজে শারীরিক, মানসিক অথবা অর্থনৈতিক দুর্দশায় থাকে, তখন কিন্তু অপরের কষ্টে তার মনে সহমর্মিতা জাগে না, বরং তখন অপরের ভোগান্তি দেখলে তার দিল ঠান্ডা হয়। হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়। এতজন বন্দী যখন জড়ো হয়ে ঠাঠা করে হাসছেন, তখন এটা মোটামুটিভাবে ধরেই নেয়া যায় যে কেউ বিপদে পড়েছেন।

সেখানে যেতেই আসামিরা খানিকটা সরে গিয়ে আমাকে জায়গা করে দিলেন। দৃশ্যটা দেখে দ্রুতই ব্যাপারটা বুঝে নিলাম। সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর বয়সের অভিজাত একজন রমণী। বোধহয় গতকাল রাতেই কারাগারে এসেছেন এবং হঠাৎ করেই হয়তো তাঁর পিরিয়ড হয়ে গেছে। পাকিস্তানি

সাদা লনের কামিজ আর সাদা সালোয়ারের পুরো পেছন দিক রক্তে মাখামাখি।

তাঁকে বোধহয় এক কাপড়ে ধরে আনা হয়েছে। বদলানোর মতো দ্বিতীয় কোনো পোশাক তাঁর কাছে নেই। ভদ্রমহিলা মাঠের ঘাসের মধ্যে মাথা নিচু করে বসে আছেন এবং যথাসম্ভব গায়ের ওড়না দিয়ে রক্তের দাগ লুকানোর চেষ্টা করছেন। আশপাশের জটলা থেকে যখন উপহাস-বিদ্রূপ ছুড়ে দেয়া হচ্ছে, তখন বোবা চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

বয়স্ক কয়েদিরা 'বদ রক্ত' দেখে এমন ভাব করছিলেন, যেন মূর্তিমান পাপ দেখতে পাচ্ছেন। নারীটি সুন্দরী ও অভিজাত পরিবারের, তাই তাঁকে তামাশার পাত্র বানিয়ে হেয়প্রতিপন্ন করে মজা লোটার ফুর্তিটা স্বাভাবিকের চেয়ে আরও অনেক বেশি।

শরমে কুঁকড়ে গেলাম। ওনাকে দেখে নয়, তাঁর বিব্রতকর অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় অন্য নারীদের কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি দেখে, আর নির্লজ্জ বাক্যালাপ শুনে। তবে মোটেই বিস্মিত হলাম না। একজন নারীকে হেনস্তা হতে দেখলে অন্য নারীরা যে খুশিও হতে পারেন, এটা আমি জীবনে প্রথমবারের মতো বুঝেছিলাম, যখন আমি গ্রেপ্তার হই। অতি সম্প্রতি ভারতে মৌমিতা নামের একজন চিকিৎসক তাঁর কর্মস্থলে গ্যাং রেপের শিকার হন। আশ্চর্য হলেও সত্য, এই নারকীয় অপরাধ ঘটার সময় মেয়েটির একটি হাত চেপে ধরে রেখেছিল তারই এক নারী কলিগ।

আমি রাগে চিৎকার করে উঠি, আপনারা কি মানুষ! কেউ একজন একটা কাপড় দেন ওনাকে, আর যদি তা না পারেন, এক্ষুনি সরেন এখান থেকে।

প্রায় সময়ই মারামারি করে পরস্পরের মাথা ফাটালে সেলাই দিতে আমাকেই কাজে লাগে, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁরা কিছুটা সমীহ করেন আমাকে। আমার চিৎকার শুনে দু-একজন অতি উৎসাহী ছাড়া বাকি সবাই কেটে পড়লেন। ঘাসের ওপর থেকে মহিলাকে টেনে তুললাম। বুঝলাম, তিনি এমন অদ্ভুত পরিস্থিতি এর আগে কখনোই দেখেননি। হতবিহ্বল হয়ে তিনি একটু একটু কাঁপছেন।

কারাগারে পোশাকের ব্যাপারটি বলি। হাজতিদের নির্দিষ্ট কোনো পোশাক নেই। বেশির ভাগ মানুষকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তিনি যে বস্ত্রে থাকেন, তাতেই থানায় নেয়া হয়। গ্রেপ্তারের পর রিমান্ড পর্ব শেষে

তিনি আদালতে প্রেরিত হন। তারপর সেখান থেকে কারাগারে। এর মধ্যে পোশাক পাল্টানোর কোনো সুযোগ তিনি পান না। কারাগারে এসে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার পর বাসা থেকে পোশাক পাঠানো হয়। সেই পোশাক চুলচেরা তল্লাশি করে কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হয়, তবে দুই সেটের বেশি কখনো নয়। এ ছাড়া জুতা, স্যানডেল, কম্বল, চাদর, তেল, সাবান, অলংকার নিষিদ্ধ।

নারী কয়েদিদের জন্য আলাদা পোশাক রয়েছে। কয়েদি-শাড়ি পরতে দেয়া হয়, যেগুলো কয়েদিরাই তৈরি করেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র আমিই কয়েদি-শাড়ি পরতাম, কেননা সেটা এতটাই ভারী যে গায়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। অন্য কয়েদিরা বিশেষ বিশেষ দিনে, বিশেষ কেউ পরিদর্শনে এলে অল্প সময়ের জন্য কয়েদি-শাড়ি কাঁধে বা কোমরে পেঁচাতেন।

হাজতিরা কয়েদি-পোশাক ব্যবহার করতে পারতেন না। যা হোক, আমি তো একজন হাজতিকে আমার কয়েদি-শাড়ি দিতে পারি না। শেষ পর্যন্ত ব্যাগ হাতড়ে এক সেট সালোয়ার-কামিজ পাওয়া গেল, যেটা গত ঈদে আব্বা পাঠিয়েছিলেন। সেগুলো একবার মাত্র পরেছিলাম। পোশাকগুলো তাঁকে দিলাম এবং পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য যা দরকার, সেই সাথে স্যানিটারি প্যাড...। এর পর থেকেই তাঁর সাথে আমার সখ্য। তাঁর নাম রূপা। তাঁকে আমি ভাবি বলে ডাকতাম।

চট্টগ্রামের অভিজাত পরিবারের মেয়ে রূপা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় এক বিতর্ক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরিচয় হয় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সুদর্শন ও ধনীর দুলাল তানভীরের সাথে। পরিচয় থেকে প্রেম। একজন আরেকজনকে ছাড়া খান না, ঘুমান না, মরেন না, বাঁচেন না টাইপের প্রেম। অতঃপর বিয়ের সিদ্ধান্ত।

তানভীরের পরিবার থেকে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু বাধা এল রূপার পরিবার থেকে। চট্টগ্রামের বনেদি পরিবারগুলো সাধারণত অন্য জেলার মানুষের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আগ্রহী থাকে না। এ কারণে রূপার পরিবার এ বিয়েতে একেবারেই রাজি নয়। পরে অনার্স শেষে নিজেরাই বিয়ে করে ফেলেন দুজন।

রূপা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষক হিসেবে চাকরি নেন, আর তানভীর পারিবারিক ব্যবসার সাথে যুক্ত হন। যে জীবন তাঁরা কাটাতেন, বাংলাদেশের

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সেটাকে অনায়াসে বিলাসবহুল বলা চলে। তিন বছর পর রূপা যখন প্রেগন্যান্ট হলেন, তখন হঠাৎ করেই তানভীর কেমন যেন বদলে যেতে শুরু করেন। ক্লাব, মদের নেশা আগেই ছিল, সেই সাথে যুক্ত হলো জুয়া খেলার নেশা। ব্যবসার আয় যতই কলাগাছের ভেলার মতো ভেসে যেতে লাগল, সংসারের সুখ ততই ফানুসের মতো উড়ে যেতে থাকল।

যথাসময়ে একটা কন্যাসন্তান হয় তাঁদের। ঠিক এমন সময় গোদের ওপর ক্যানসারের মতো তানভীরের জীবনে সানজানা নামের এক মেয়ের আবির্ভাব ঘটে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সুন্দরী মেয়েদের স্বামীদেরই পরকীয়া প্রেমে বেশি আসক্ত হতে দেখা যায়। বোধহয় তাঁদের সৌন্দর্যপিপাসু মন কখনোই তৃপ্ত হয় না। তাঁরা ভেবেই নেন যে একজন সুন্দরী নারীকে যদি তিনি একান্ত নিজের করে পেতে পারেন, তাহলে জগৎসংসারের সব নারীকেই চাইলে হাতের মুঠোয় নেয়া জটিল কিছু নয়।

স্কুলের চাকরির ব্যস্ততা আর শারীরিক অসুস্থতার কারণে আসন্নপ্রসবা রূপা তানভীরের চলাফেরা, কার্যকলাপ এত দিন ভালোমতো লক্ষ করেননি। পরবর্তী সময়ে মাতৃত্বকালীন ছুটির অবসরে রূপার প্রতি তানভীরের অমনোযোগ, অবহেলা আর শিশুকন্যার প্রতি ঔদাসীন্য প্রবলভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠল।

রূপা সম্পর্কের শুরু থেকেই কিছু ব্যাপারে যথেষ্ট উদার। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রত্যেক মানুষের কিছু নিশ্বাস নেয়ার জানালা দরকার। তাই স্বামীর মুঠোফোন ঘাঁটাঘাঁটি কিংবা ভিডিও কলে এসে খবরদারি করাটা তিনি নিতান্ত অরুচিকর বলে মনে করতেন। দীর্ঘদিন প্রেম আর সংসারজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তানভীরের প্রতিটি টুকরো শব্দ, চাহনি এবং কথায় কথায় রেগে ওঠা – প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে রূপা বুঝতে পারেন, তানভীর তাঁর থেকে সরে যাচ্ছেন অনেক দূরে। এতটা দূর যে অনেকটা বালতির পানিতে প্রতিফলিত পূর্ণচন্দ্রের মতো, যাকে দেখা যায়, কিন্তু ধরা বা ছোঁয়া যায় না।

এভাবে সময় অতিবাহিত হতে থাকে। তানভীর ব্যবসার কারণে দু-তিনটি ব্যাংক থেকে বড় অ্যামাউন্টের টাকা চড়া সুদে ঋণ নেন। সেই ঋণের জামিনদার বা গ্যারান্টর হতে হয় রূপাকেই। রূপা বুঝতে পারেন, চারদিকটা কেমন যেন এলোমেলো, কোথায় যেন কী একটা ভাঙনের শব্দ অনুরণিত

হচ্ছে। সেই শব্দ কান পাতলে শোনা যায় না, কিন্তু মন পাতলে স্পষ্ট শোনা যায়।

রূপার মেয়ের বয়স যখন চার বছর – রূপার স্কুলেই সে নার্সারিতে পড়ে – তখন একদিন মেয়ের হঠাৎ করেই পেটব্যথা শুরু হয়। দ্রুতই মেয়েকে একটি ক্লিনিকে নিয়ে যান তিনি। তানভীরকে ক্রমাগত কল করেও ফোনে পান না। মেয়ে একটু সুস্থ হলে অসময়ে মেয়েকে নিয়ে বাসায় ফিরে আসেন রূপা।

চাবি ঘুরিয়ে লক খুলে নিজের রুমে ঢোকার পথেই থমকে যান তিনি। নিজের সাজানো বেডরুমে যখন কামার্ত দুটি শরীর জড়াজড়ি করে থাকতে দেখেন নিজেরই সযত্নে গোছানো বিছানায়, তখনই তিনি বুঝে ফেলেন, ওই বিছানা থেকে তিনি ছিটকে পড়েছেন; পড়েছেন তানভীরের হৃদয়ের আসন থেকেও। চিরতরে। সেদিনই মেয়েকে নিয়ে চট্টগ্রামের বাসে ওঠেন রূপা।

বাপের বাড়িতে সাদরে বরণ না করা হলেও অনাদর হয় না। হাজার হোক বাবার বাড়ি, যদিও তত দিনে বাবা আর বেঁচে নেই, তবে মা আছেন। আগের ভুলগুলো ভুলে থাকার জন্য চট্টগ্রামে মেয়েদের একটা স্কুলে চাকরি শুরু করেন রূপা।

এখানে এসে কেমন যেন বদলে যেতে থাকেন তিনি। আসলে এত বড় মানসিক আঘাত নেয়ার মতো ক্ষমতা বোধহয় তাঁর ছিল না। বেশির ভাগ সময় বিষণ্ন থাকতেন। খাওয়াদাওয়ায় রুচি নেই, ওজন কমে অর্ধেক হয়ে গেল। হঠাৎ হঠাৎ শুনতে পেতেন তানভীরের গলার শব্দ, তানভীরের হাসি – পরে আবার সব মিলিয়ে যায়।

অন্ধকার রুমে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে হঠাৎ দেখতে পান ঘর্মাক্ত ক্লান্ত প্রেমিক-প্রেমিকার অর্ধনগ্ন দুটি শরীর। চিৎকার করে উঠতেই মিলিয়ে যায় শরীর দুটো। দিনের পর দিন অবচেতন মনে তিনি তানভীরের একটা ফোনের প্রতীক্ষা করেন, কিন্তু সেই ফোন আর আসে না। হ্যালুসিনেশন বাড়তে বাড়তে এমন পরিস্থিতি হয়, রূপার ভাই তাঁকে মানসিক চিকিৎসকের কাছে নিতে বাধ্য হন।

এক মাস ক্লিনিকে ভর্তি থেকে ইনজেকশন নিতে হয়। এরপর বাসায় ফিরে ওষুধ চলে, সেই সাথে চলে পরিবারের সদস্যদের কাউন্সেলিং। ছয় মাস পর রূপার মানসিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়, শুধু হঠাৎ হঠাৎ চমকে

উঠে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আনমনা হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো সমস্যা দেখা যায় না।

একদিন বাগানে চেয়ার পেতে বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ভাবছেন, দীর্ঘ ছুটির পর আবার স্কুলে জয়েন করবেন কি না। এমন সময় একেবারেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে পুলিশ উপস্থিত হয়। তানভীর লোন নিয়ে শোধ না করায় মামলা করেছে ব্যাংক। অন্যদিকে তানভীর আর সানজানা দুজনই পলাতক। সম্ভবত মালয়েশিয়ায় আছেন। কাজেই গ্যারান্টর রূপার নামেই ওয়ারেন্ট হয়েছে।

অবাক হওয়ার সময়টাও পাওয়া গেল না, হতবিহ্বল রূপাকে পুলিশের গাড়িতে ওঠানো হলো। রূপার একমাত্র ভাই তখন দেশে নেই। ভাবি পর্দানশিন, সংসারী মেয়ে। মামলা, আদালত – এসব বিষয়ে কিছুই বোঝেন না তিনি।

কারাগারে আসার পর মানসিক চিকিৎসকের দেয়া ওষুধগুলো হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গেল। রূপা প্রথম প্রথম কিছু জানাননি। পরে যখন তাঁর কাছে ঘটনা শুনলাম, তাকে নিয়ে কারাগারের মেডিক্যালে গেলাম। কেন যেন মানসিক সমস্যা বা মানসিক ব্যাধিকে আমাদের দেশে এখনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। মানসিক রোগের কোনো ওষুধের সরবরাহ বা সংগ্রহ এখানে নেই এবং এ বিষয়ে কারও তেমন জ্ঞান নেই, মাথা ব্যথাও নেই। উনি ওষুধের নাম মনে করতে পারছেন না, তাই আমিও কিছু করতে পারলাম না। আকস্মিক ওষুধ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দিনে দিনে ওনার অবস্থা খারাপ হতে লাগল।

যে ওয়ার্ডে উনি থাকতেন, সেখানে আসামিরা অকারণেই ওনার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতেন। উনি বাথরুমের সিরিয়ালে দাঁড়ালে ওনাকে ধাক্কা দিয়ে পেছন থেকে সবাই সামনে চলে যেতেন। ওনার পরনের কাপড় ধুয়ে শুকাতে দিলে চুরি করে নিয়ে যেতেন কেউ কেউ। খেতে বসলে খাবারে পানি ঢেলে দিতেন। কাপড়ের ব্যাগে ময়লা ঢেলে রাখতেন। উনি হেঁটে গেলে আসামিদের সন্তানরা 'পাগলি পাগলি' বলে ঢিল ছুড়ত।

মানুষ বোধহয় একমাত্র প্রাণী, যারা অকারণে অজানা কারও প্রতি মমতায় বিলীন হতে পারে, আবার সম্পূর্ণ বিনা কারণে অজানা কারও প্রতি নির্মম ও নির্দয় হয়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া নিষ্ঠুরতা বোধহয় মানুষের

মজ্জাগত। নাহলে রাস্তায় শিশুরা খেলাচ্ছলে ঢিল ছুড়ে একটি বিড়ালকে খোঁড়া করে দেয় কেন? পথের একটি কুকুরের গায়ে ভাতের গরম মাড় ছুড়ে দেয় কেন? কেউ তো তাদের এগুলো শিখিয়ে দেয়নি।

একদিন বাগানে কাজ করছি, ভাবি এসে চুপচাপ পাশে বসলেন। ঠোঁট ফুলে গেছে, একপাশে রক্ত জমাট হয়ে আছে। আমি আঁতকে উঠে বললাম, কী হয়েছে ভাবি? ঠোঁট কেটেছে কেমন করে?

ভাবি জানালেন, তিনি হাউজে গোসলের সময় অন্য একজনের রেখে যাওয়া মগ ব্যবহার করেছিলেন। যে কয়েদির মগ তিনি ব্যবহার করছিলেন, চিহ্ন দিয়ে রাখা সত্ত্বেও এর আগে তাঁর নাকি দুবার মগ চুরি হয়েছে। সেই আগের দুবারের লোকসানের পূর্ণ ক্ষোভ নিয়ে তিনি রূপার ওপর চড়াও হলেন। বকাবকি শুরু করলেন, "পাগলি মাগি, বোবা সাইজা থাকস, চেহারা ভদ্র অথচ কামে চুন্নি!" আরও কিছু অশ্লীল বাক্য।

রূপা মিনমিন করে কিছু বলতে যেতেই ঠাস করে মগ দিয়ে ঠোঁটের ওপর বাড়ি। অসহায় কারও ওপর আস্ফালন করতে ওস্তাদ সবাই। 'নরমের যম' বলে কথা। আমি রূপার হাতটি ধরলাম। তিনি কাঁপছেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, "তানভীর, তানভীর...। উফ! এত কষ্ট! এত কষ্ট কেন পৃথিবীতে?"

আমি মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ, আমার জামিনের দেরি হোক, তুমি ভাবির জামিনটা দ্রুত করিয়ে দাও। কেননা তুমি তোমার বান্দাকে ততটুকুই কষ্ট দাও, যেটা সহ্য করার ক্ষমতা তার আছে। আমি সহ্য করতে পারব, ভাবি পারবেন না।

আল্লাহ আমার মতো মজলুমের দোয়া কবুল করেছিলেন। শেষের দিকে ভাবি একেবারেই খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেয়ায় কারাগারের মেডিক্যালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। সেখানে পাঁচ দিন থাকতেই তাঁর জামিন হয়। বের হওয়ার পর চরম মানসিক বৈকল্যের জন্য তাঁকে মানসিক হাসপাতালে তিন মাস ভর্তি থাকতে হয়েছিল।

এখন উনি সম্পূর্ণ সুস্থ, চট্টগ্রামে থাকেন। সেখানে স্কুলের চাকরিতে যোগদান করেছেন। ওনাকে যে এক সেট পোশাক আমি দিয়েছিলাম, সেটা তিনি সযত্নে রেখে দিয়েছেন। মাঝে মাঝেই বের করে দেখেন, গন্ধ শোঁকেন। সেখানে নাকি উনি আমার গায়ের গন্ধ পান।